শ্লীল অশ্লীল বনাম রাজনীতি

সোমেশ্বর ভৌমিক

অথবা

ভারতে সেন্সরশিপের হালচাল নিয়ে দু-একটা কথা যা আমি জানি

২০০২ সালের ১৩ জুলাই সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদের সভাপতি বিজয় আনন্দ পদত্যাগ করেছেন। আসলে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদকে আমরা, সাধারণ নাগরিকেরা, চিনি ফিল্ম সেন্সর বোর্ড নামে। কিন্তু 'সেন্সর' কথাটায় যেহেতু পীড়ন, নির্যাতন বা বিধিনিষেধের ব্যঞ্জনা আছে, তাই ১৯৮২ সালে কথাটাকে বদলিয়ে করা হয়েছে 'অনুমোদন'(certification) । অবশ্য তাতে এই পর্ষদের কাজের ধারায় মূলেস্থূলে কিছু পরিবর্তন হয় নি। ভারতের সিনেমাহলে যে-কোনো ছবি দেখানোর আগেই সে - ছবিকে এই পর্ষদের অনুমোদন নিতে হয়। দেশি-বিদেশি , সব ছবির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। এটাই আইন। বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পর্ষদ একটি ছবিকে প্রদর্শনের যোগ্য অথবা অযোগ্য বিবেচনা করে সেই মর্মে রায় দেয়। এই ছাড়পত্র ছাড়া সিনেমাহলে কোনো ছবি দেখানো বেআইনি। ফলে চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব খুবই গুভার সন্দেহ নেই। সরকার এই গুদায়িত্ব অর্পণ করেন নিজেদের মনোনীত কোনো মানুষকে। এটাই রীতি।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, প্রায় আমন্ত্রণ জা নিয়েই, বিজয় আনন্দের হাতে চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদের দায়িত্ব সঁপে দিয়েছিলেন। এবং গত দশ মাস ধরে বিজয় অ ানন্দকে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় আমরা দেখেছি। আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্র হিমাচল চষে বেড়িয়েছেন এককালের ডাকস াইটে এই পরিচালক। উনি ১৯৫২ সালে প্রণীত ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন। কারণ, পঞ্চাশ বছর অ াগেকার এই আইনের অনেক কিছুই নাকি এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে; উদারনীতি আর ঝিায়নের মহাযজ্ঞে সামিল হতে গেলে সেই আইনের আমূল পরিবর্তন ছাড়া গতি নেই বলেই তাঁর ধারণা। আর যেহেতু সেই আইনের ভরকেন্দ্র হিসেবে আছে চলচ্চিত্র অনুমোদনের রীতিনীতি, বিজয় আনন্দের তৎপরতা আবর্তিত হচ্ছিল মূলত সেগুলিকে ঘিরেই। ক াজও অনেকদূর এগিয়েছিল। তৈরি হয়েছিল দুই খন্ডের একটি গুত্বপূর্ণ দলিল। সেই দলিলে ছিল পৃথিবীর ১২টি দেশে প্রচলিত চলচ্চিত্র অনুমোদন-ব্যবস্থার বিবরণ, সাম্প্রতিক কিছু বিতর্কিত ছবি নিয়ে বিভিন্ন আদালতের রায় (যার মধ্যে অ াছে শেখর কাপুরের ছবি 'ব্যান্ডিট কুইন' নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ও), কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদের বিভিন্ন অ াঞ্চলিক শাখার মতামত/প্রস্তাব, চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে নেওয়া মতামত, এবং অন্তত দুজন আইনজ্ঞের মতামত। আলোচনার মাধ্যমে গঠিত একটি কোর কমিটির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই দলিলটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতিকে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এবং গণতান্ত্রিক বলে মেনে না নেওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু কোর কমিটির সভা বসার প্রায় পূর্বাহে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই দলিলের বিষয়ে শুধু আপত্তিই জানানো হল না, বিজয় আনন্দকে প্রায় নির্দেশ দেওয়া হল ওই 'আপত্তিকর' অংশগুলিকে বিবেচনার আওতা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য !১

অতঃপর বিজয় আনন্দের প্রস্থান। অবশ্য এ-ঘটনার এখানেই শেষ নয়। ইতিমধ্যে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন অরবিন্দ ত্রিবেদী। বিজয় আনন্দের মতো 'করিশমা' তাঁর না থাকতে পারে। কিন্তু উনি মোটেই হেলাফেলার পাত্র নন। অ ামার-আপনার সকলের প্রিয় 'রাবণশ্রী'--- আজ্ঞে হ্যাঁ, রামানন্দ সাগরের সেই স্বর্গীয় টেলিভিশন সিরিয়াল 'রামায়ণ'-এর মুখ্য চরিত্র। অবশ্য, সিরিয়াল-এর অভিনেতা থেকে অধুনা তাঁর উত্তরণ হয়েছে লোকসভা-সদস্যপদে। মাঝে কিছুদিন মন্ত্রীত্বও করেছেন বলে শোনা যায়। সিরিয়ালে টেলিভিশনের পর্দায় 'রাবণ' হিসেবে উনি 'রাম' এর প্রতি যতই 'অধর্ম' করে থাকুন, বাস্তবে অরবিন্দ ত্রিবেদী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, দায়িত্বসচেতন মানুষ। দায়িত্ব নিয়েই উনি ঘোষণা করেছেন " চলচ্চিত্র হল আমাদের সমাজের গঙ্গোত্রী। পূতপবিত্র বিনোদনধারা। এটিকে কখনোই আমাদের কলুষিত হতে দেওয়া

উচিত নয়।" ২

ঠিক কিভাবে বিজয় আনন্দ ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রটিকে কলুষিত করার আয়োজন করছিলেন, তার ইতস্তত বিবরণ আমরা বিভিন্ন সূত্রে পেয়েছি। অবশ্য তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার বদলে আরও জটিল হয়ে গেছে। পদত্যাগ নিয়ে বির্তকে র জেরে বিজয় আনন্দ এখন সমাজের এক অংশের কাছে বরণীয় শহীদ, আর সরকার বা প্রশাসন হল জল্লাদ। কিন্তু সরকার জল্লাদ বলেই বিজয় আনন্দ শহীদ, এরকম একটি দ্বন্দ্বমূলক সমীকরণ বা সরলীকরণ কি আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য? ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন বিজয় আনন্দ?

বিভিন্ন খবরের কাগজে এই লঙ্কাকান্ডের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে কেরল থেকে আসা একটি প্রস্তাবকে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যেসব ছবি যৌনবিষয়-কেন্দ্রিক, বা যেসব ছবিতে খুব স্পষ্টভাবে যৌনবিষয়ের উপস্থাপনা আছে, সেগুলিকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা না করে নির্বাচিত কিছু সিনেমাহলে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। বিজয় আনন্দের অপরাধ, উনি এই প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে তাই মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, যৌনবিষয়-কেন্দ্রিক ছবির প্রদর্শনকে আইনসম্মত করার যে প্রস্তাব এসেছে, সেটিকে বিবেচনা করা উচিত হবে না। এমনকি সরকারের কাছে তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, এধরনের প্রস্তাব চলচ্চিত্রে প্রাক্-অনুমোদনেরও মূল উদ্দেশ্যকেই লঙঘন করে। বিজয় আনন্দ এই সরকারি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন, "আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টি খতিয়ে দেখাই, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনো আলোচনা হওয়ার আগেই এর পরিসর সীমিত করা হল। ফলে চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদ থেকে আমার পদত্যাগ করাই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য উপায়। আপনারা আপনাদের পছন্দের কাউকে এপদে বসান, যিনি সরকারি হুকুমনামা মেনে চলবেন।" ৪

দুই খন্ডের সরকারি দলিল থেকে একটিমাত্র বিষয়কে বেছে নিয়ে যে এরকম একটা ধুন্ধুমার কান্ড ঘটানো গেল, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে আমাদের সমাজ এখনো আপাদমস্তক সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন। এবং এই সমাজকে নিয়ন্ত্রণও করে সামন্ত্রতান্ত্রিক রীতিনীতি। সরকারের গা-জোয়ারিতে বিষয়টির প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটা ধরা পড়ে যায়। এটা এতই প্রকট যে সরাসরি প্রতিবাদ জানানো ছাড়া এর কোনো বিশদ আলোচনার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আমাদের চিন্তা অন্য জায়গায়।

বিজয় আনন্দ পদত্যাগ করার পরে পত্রপত্রিকায় যেসব বিবরণ বা বিশ্লেষণ চোখে পড়েছে, সেখানেও এই সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই পরিষ্কার। 'আধুনিক' সমাজে সিনেমার পর্দায় যৌনবিষয়ের অবতারণা হওয়া উচিত কিনা, বিতর্কের গন্ডিটাকে এভাবেই নির্দিষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। যেন্নীল-অশ্লীলের মাত্রা নির্ধারণ এবং তার নিয়ন্ত্রণই সেন্সরব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য!৫

পদত্যাগ-পরবর্ত্তী প্রতিত্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজয় আনন্দ যা বলেছেন, তাতে ধরা পড়ে এই ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। "আমরা নতুন একটা আইন প্রণয়ন করতে চাইছিলাম, যা আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। ..... আমাদের ছবিতে সাধারণ একটা চুম্বনদৃশ্যই সরাসরি দেখাতে দেওয়া হয় না, অথচ সেখানে ন্যক্কারজনক দৃশ্যের ছড়াছড়ি।"৬ এমনকি বিজয় আনন্দ একথাও বলেছেন যে এদেশে সিনেমাদর্শকের সিংহভাগই যুবক-যুবতী, অথচ তারা কী ছবি দেখবে তা স্থির করে দিচ্ছে পঞ্চাশ থেকে আশি বছর বয়সীদের নিয়ে তৈরি অনুমোদন পর্ষদ! কাগজে-কাগজে এবিষয়ে দেখা গেছে বেশ চটকদার প্রশ্নঃ আমরা আর কবে বড়ো হবো?

পুরো ব্যাপারটাকে যৌনগন্ধী বিতর্কের রূপ দেওয়ায় আর যাই হোক পরিণত মননের বা আধুনিক যুক্তির খুব পরিচয় পাওয়া গেল না। নীল-অশ্লীল, চি-অচি, শুচিতা-অশুচিতা, যৌনতা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো খুব জরি সন্দেহ নেই --- আজও। কিন্তু বিজয় আনন্দের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলিকে টেনে আনা হয়েছে খবরকে নিছক মুখরোচক করার জন্যে। এইসব প্রশ্নের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনার কোনো চেষ্টাই সেখানে নেই। তথাকথিত আধুনিকতার এই প্রদর্শনী দেখানেপনারই নামান্তর। আর কে না জানে, দেখানেপনা হল সামন্ততন্ত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ।

অযৌক্তিত বির্তকের এই ভিড়ে বরং প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য জুগিয়েছেন দ্য স্টেট্স্ম্যান পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক রবীন্দ্র কুমার।৭ তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের গোঁসার মূলে আছে দুটি প্রস্তাবঃ

১) স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো সমস্ত ছবির অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা; এবং
২) অনুমোদন পর্ষদের সদস্য হিসেবে একমাত্র তাঁদেরই মনোনয়ন দেওয়া যাঁরা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত অথবা এই শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

সিনেমাহলে দেখানো ছবির জন্যে অনুমোদন পর্ষদের ছাড়পত্র নেওয়া যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে টেলিভিশনে দেখানো ছবির ক্ষেত্রেও সেই ছাড়পত্র নেওয়া কেন বাধ্যতামূলক হবে না, সেই প্রশ্নটি খুবই যুক্তিসঙ্গত, সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত অবশ্য জানিয়ে রাখা ভালো, সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র লাগে না বলে যে টেলিভিশনে দেখানো ছবির ওপর কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, তা নয়। এক্ষেত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্যে আছে সরকার - প্রবর্তিত সম্প্রচার বিধি (Broadcast Code) ।৮ বিজয় আনন্দের নিজেরই কথায় উনি চেয়েছিলেন দুটি মাধ্যমের জন্যেই সম-আচরণ (level playing field) ।৯ তার জন্যে একটিই সরকারি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ন্ত্রণের পরিসর নির্মাণ বা নির্ধারণ করাই ছিল তঁার লক্ষ্য। নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া নয়। আগামী যুগের উপযোগী একটি সেন্সরব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন উনি। তবে তাঁর উদ্দিষ্ট এই সেন্সরব্যবস্থায় একমাত্র বিবেচ্য উপাদান ছিলনীল-অশ্লীলের একটি আপাত-সীমারেখা। হয়তো বিজয় আনন্দ এটাই চেয়েছিলেন যে, মাঝে মধ্যে সেই সীমারেখা নিয়ে তৈরি হোক্ বিতর্ক। সেই বিতর্কে আর যাই হোক্, অভাব হত না মুখরোচক উপাদানের।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সুস্থবুদ্ধির মানুষই দ্বিমত হতে পারেন না। একমাত্র ভারতেই এটা সম্ভব যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, এমন একজন মানুষও অনুমোদন পর্ষদের সরকার-মনোনীত সদস্য হিসেবে ছবির সামাজিক অভিঘাত তথা সেটির প্রদর্শনযোগ্যতা বিচার করতে পারেন। এবং এমন একজন মানুষের ওপরেই ন্যস্ত থাকে আমাদের সংবিধান-স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকারের১০ ওপর আরোপিত 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' (reasonable restrictions) প্রয়োগের ভার। লক্ষণীয়, এখানে অনুমোদন পর্ষদে সদস্য (এবং সভাপতিও) মনোনয়নের ব্যাপারে সরকারের স্বেচ্ছাচারী বা দাক্ষিণ্য-বিতরকের ভূমিকাকে সমালোচনা করা হচ্ছে না; সমালোচিত হচ্ছে মনোনীত ব্যক্তির যোগ্যতা-নির্ধারণের মাপকাঠিটুকু। প্রশ্ন হল, তথাকথিত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মানুষও মৌলিক অধিকারের ওপর আরোপিত 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' প্রয়োগের মতো একটি আইনি বিষয়ে কতখানি দক্ষতা এবং সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারবেন সেটা কি ভেবে দেখা হয়েছে? মৌলিক অধিকার এবং তার ওপর আরোপিত 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ'-এর ব্যাখ্যা নিয়ে আইনজ্ঞদের মধ্যেই কোনো মতৈক্য নেই; মাঝে- মধ্যেই তাঁরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। অথচ সিনেমার ক্ষেত্রে সেই 'বিধিনিষেধ' -এর ব্যাখ্যার ভার পড়ে কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের ওপর। অবশ্য এখানে বলা হতে পারে যে, অনুমোদন পর্ষদের সদস্যরা সরাসরি 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' প্রয়োগ করেন না। তাঁদেরপরিশ্রম লাঘব করার জন্য তৈরি হয়েছে 'ফিল্ম সেন্সরশিপ বিধি'। সেই বিধি অনুযায়ী তাঁরা একটি ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়ার বা না দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কজন একথা জানেন যে, ১৯৬৯ সালেই এইসব বিধি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন একজন বিচারপতি? অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতি জি ডি খোসলা ১৯৬৯ সালে একটি সরকারি অনুসন্ধান পর্ষদের সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই অনুসন্ধান পর্ষদকে সাধারণভাবে ' খোসলা কমিটি' বলা হয়, যদিও তার পোষাকি নাম ছিল 'ফিল্ম সেন্সরশিপ বিষয়ে অনুসন্ধান পর্ষদ'। তাঁর প্রতিবেদনে বিচারপতি খোসলা লিখেছিলেন ঃ "আমাদের অনুসন্ধানে একথা পরিষ্কার যে চলচ্চিত্র-অনুমোদনের ব্যাপারে যেসব বিধিনিয়ম এখন চালু আছে, সেগুলোর পিছনে কোনো আইনি অনুমোদন তো নেই-ই, সেগুলোকে যুক্তিসঙ্গত বা সুবিবেচনাপ্রসূতও বলা যাবে না।"১১ তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারি মহলে এ-ব্যাপারে কোনো উচচবাচ্য করা হয় নি। এই মৌলিক অসঙ্গতি দূর করার কোনো পরামর্শ বা চেষ্টা কি এই প্রস্তাবে আছে?

বিজয় আনন্দের 'শহীদ' হওয়ার ঘটনায় অবশ্য চাপা পড়ে গেছে সাম্প্রতিক আর-একটি গুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০০২ সালের ৬ই জুন তথ্যচিত্র-নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধনের ছবি 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' এর মূল্যায়ন করেন অনুমোদন পর্ষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে তৈরি এগজামিনিং কমিটি। পটবর্ধন তাঁর এই ছবিতে ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক শত্রুতার সম্পর্ক, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে দু-দেশের রেষারেষি আর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের যুদ্ধ -যুদ্ধ খেলা এসবকিছুই বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গীতে। ছবিটি দেখার পর এগ্জামিনিং কমিটির মত হল ঃ

ক) পাকিস্তানীরা ভারতের জাতীয় পতাকা পোড়াচ্ছে, এই দৃশ্য বাদ দিতে হবে (অবশ্যই ভারতীয়রা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়াচ্ছে, এমন দৃশ্য বিষয়ে কোনো আপত্তি ওঠে নি।)
খ) বৌদ্ধ দলিত নেতা যেখানে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে পারমাণবিক পরীক্ষার সমালোচনা করেছেন, সেই অংশ বাদ দিতে হবে।
গ) বাদ দিতে হবে দলিতদের একটা গান, যে গানে বলা হয়ছে গান্ধীজীর হত্যাকারী একজন ব্রাহ্মণ।
ঘ) বাদ দিতে হবে একটি সাক্ষাৎকারের অংশ, যেখানে একজন বিজ্ঞানী বলছেন, 'চীন হল আমাদের পরবর্তী শত্রু'।
ঙ) ছবি থেকে বাদ দিতে হবে তেহেল্‌কা - সংক্রান্ত সমস্ত দৃশ্য আর কথাবার্তা। (বর্ফস কামান কেনা নিয়ে দুর্নীতির যেসব উল্লেখ ছবিতে আছে, সেবিষয়ে কোনোই আপত্তি তোলা হল না।)
চ) সাধারণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও ছবি থেকে বাদ দিতে হবে।১২

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-অনুমোদন বা ফিল্ম সেন্সরশিপের ব্যাপারটা শুধু ছবিতেশ্লীল-অশ্লীলের মাত্রা নির্ধারণ বা নৈতিক আচরণের সীমানা চিহিত করাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার যে একটা রাজনৈতিক ভূমিকাও আছে, এই উদাহরণ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। অথচ বিজয় আনন্দের পদত্যাগ বা যৌনতার প্রশ্নে ভারতীয় ছবির 'সাবালক' হয়ে ওঠা নিয়ে যে পরিমাণ প্রতিবাদ ব া বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার একটা সামান্য ভগ্নাংশও এক্ষেত্রে চোখে পড়ে নি। যে-এগজামিনিং কমিটি 'ওয়ার এন্ড পিস' ছবির অনুমোদন আটকে দিয়েছেন তাতে নিশ্চিতভাবেই বিজয় আনন্দ ছিলেননা। কিন্তু সেই সময়ে তিনিই ছিলেন অনুমে াদন পর্ষদের সর্বেসর্বা। ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে আধুনিক রূপ দিতে আগ্রহী বিজয় আনন্দ নিজের পদা ধিকার প্রয়োগ করে 'ওয়ার এন্ড পিস' ছবিকে ছাড়পত্র দিতে বলেছেন বলে শোনা যায় নি। উনি বরং এ-ছবির কিছু দৃশ্যকে 'আপত্তিকর' বলেই মনে করেছেন। তাঁর আশঙ্কা, এইসব দৃশ্য থেকে গন্ডগোল বাধতে পারে। একটা ছবিকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হোক্, এটা বিজয় আনন্দ চাননি। এমনকি তাঁরই অনুপ্রেরণায় ফিল্ম সেন্সরশিপের সংস্কার নিয়ে আলোচনার জন্য দুই খন্ডের যে-নথিটি তৈরি হয়েছিল তাতেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেন্সরশিপের প্রয়োগ বিষয়ে কোনো সুপারিশ ছিল না।

তার মানে কী দাঁড়ালো? রাজনৈতিক কারণে ফিল্ম সেন্সরশিপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বশংবদ হওয়ার মধ্যে বিজয় আনন্দ দোষের কিছু দেখেন না। মনে হয়, ফিল্ম সেন্সরশিপের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিষয়ে তাঁর সমর্থনই আছে ...... অন্তত অসমর্থন নেই। তাঁর আপত্তি কেবল ফিল্মেশ্লীল-অশ্লীল আর নৈতিক আচরণের সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে সরকারি হুকুমনামা মানতে! সেখানে উনি এতই বিপ্লবী যে, আচমকা পদত্যাগ করার পরে একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে উনি এ-ও বলেছেন যে, সরকার তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল।১৩

ফিল্ম সেন্সরশিপ নিয়ে এরকম দ্বিচারিতার এটাই প্রথম বা একমাত্র উদাহরণ নয়। ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপ চালু হয়েছিল ১৯২০ সালের ১ জুলাই। ১৯১৭ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন মোতাবেক এই ব্যবস্থা। ১৯১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বৃটিশ ভারতের আইন প্রণয়ন পরিষদে খসড়া আইনটি পেশ করে ভারতের গভর্নর জেনার‍্যাল এর স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্ট া স্যর উইলিয়াম ভিনসেন্ট বলেছিলেন ঃ "দুটি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে --- (ক) দর্শকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এবং (খ) আপত্তিকর ছবি যাতে দেখানো না হয় তার ব্যবস্থা করা। কুচিপূর্ণ বা অনভিপ্রেত ছবি অথবা সেইসব ছবি যেগুলি ধর্মীয় অনুভূতি বা জাতিগত চেতনায় আঘাত করতে পারে, সেগুলির বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।" ১৪

কিন্তু এই সরকারি বয়ানে ধরা পড়ে না আইনটির সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রণয়নের প্রস্তুতিপর্বেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন দলিলে লেখা হয়েছিল ঃ "কৌশলগত এবং অন্যান্য কারণে এই খসড়া আইনের রাজনৈতিক তাৎপর্যটিকে প্রকাশ্যে গুত্ব না দেওয়াই উচিত হবে। বরং এই আইনের উদ্দেশ্য হিসেবে দর্শকের নিরাপত্তাবিধান আর অশালীন প্রদর্শনীর নিবারণের মতো কারণগুলিকেই সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হবে।" ১৯২২ সালের ১ জুন তৎকালীন ভারতসচিব ভ াইকাউন্ট পীলকে পাঠানো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি প্রতিবেদনেও দেখেছি এ-কথার প্রতিধ্বনি ঃ "কেবল অশ্লীল ছবির প্রদর্শনে বাধা দেওয়াই সেন্সরব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য নয়, রাজনৈতিকভাবে আপত্তিকর ছবিকে রোখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"১৬ অর্থাৎ ফিল্ম সেন্সরশিপের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে প্রথম থেকেই চলছে লুকোচুরি। অবশ্য বৃটিশ ভারতে লুকোচুরির কৌশল ঠিক করেছিল রাষ্ট্র, বা আরো ঠিক করে বললে আমলাতন্ত্র।

স্বাধীন ভারতে এই লুকোচুরি পেল এক অন্য মাত্রা। এবারে রাষ্ট্রের পাশাপাশি লুকোচুরির ক্ষেত্র তৈরি করতে জনস্বর বা

পাবলিক ভয়েস এর ভূমিকাও কম নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই জনপরিসরে, বিশেষ করে পত্রপত্রিকার পাতায়, ফিল্ম সেন্সরশিপকে তুলে ধরা হলশ্লীল-অশ্লীল আর নৈতিক বিচারের ক্ষেত্র হিসাবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসেই বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ফিল্মিন্ডিয়া (Film india) পত্রিকায় সেন্সর বোর্ডের প্রশংসা করা হল। পত্রিকার মতে, স্বাধীনতার পরে সেন্সর বোর্ড সিনেমার পর্দা থেকে 'অসামাজিক আবর্জনাকে দূরে রাখার ব্যাপারে' সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। পত্রিকাটি অ ারো বললো, ''তাঁরা (অর্থাৎ সেন্সর বোর্ড) যদি তাঁদের এই সতর্ক তৎপরতা বজায় রাখেন, তাহলে অচিরেই আমাদের সিনেমা হয়ে উঠবে পরিচ্ছন্ন, শিক্ষামূলক অথচ মনোরঞ্জনধর্মী , যা আবালবৃদ্ধবনিতাকে সঠিক বিনোদন পেতে সাহায্য করবে।''১৭ ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে প্রবীণ চলচিচত্র প্রযোজক চন্ডুলাল শাহ্ প্রযোজকদের কাছে এক আবেদন জা নিয়ে বললেন, '' কেবল ত্বরিত অনুমোদন পাওয়ার জন্যেই নয়, জনসাধারণের স্বার্থেই আমাদের উচিত পরিচ্ছন্ন ছবি তৈরি করে দেখানোর ব্যবস্থা করা।'' ১৮ ছবির পর্দায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে সেন্সর বোর্ডের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বেসকারি এইসব আলোচনা বা মতামত স্বাধীন ভারতেও ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটিকে প্রচ্ছন্ন রাখার পক্ষে জরী অস্ত্রটি সরকারের হাতে তুলে দিল। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আর বি দিবাকর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের প্রথম সভায় এই বে ার্ডকে বললেন একটি 'গরীয়াণ প্রচেষ্টা' (dignified effort) । তাঁর কথায়, এরই তত্ত্বাবধানে সিনেমা হয়ে উঠবে 'স্বাস্থ্যকর বিনোদন, জাতীয় সংস্কৃতি আর জনশিক্ষার আদর্শ আধার'।১৯ সেন্সর বোর্ডের উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে আরো বিস্তারিত উপদেশ (নাকি নির্দেশ?) এল এই বছরেরই নভেম্বর মাসে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভা উপলক্ষে পাঠানো এক বাণীতে উনি বললেনঃ ''শিক্ষিত এবং সংস্কৃতি মনা মানুষদের কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের কাছে অনেক আশা। তাঁরা চান ছবির পর্দায় আসুক লক্ষণীয় উন্নতি এবং সেখান থেকে নির্বাসিত হোক্ (ক) বিজাতীয় প্রেমের দৃশ্য, যা আমাদের সমাজের পক্ষে অস্বাভাবিক, (খ) অশ্লীল এবং উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য, কুচিপূর্ণ যৌন আবেদন তৈরি করা ছাড়া য ার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, (গ) অস্বাস্থ্যকর মনোরঞ্জন, যা জনসাধারণকে পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো নিজেদের জীবনে অনুসরণ করতে প্রভাবিত করে, (ঘ) সরাসরি বা পরোক্ষ পাপ, শয়তানি, হিংস্রতা, অপরাধ বা অসামাজিক প্রবণতার গুনকীর্তন করে এমন দৃশ্য, এবং (ঙ) দুর্বৃত্ত আচরণ বা বর্বরতার দৃশ্য।''২০ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে ফিল্ম সেন্সর ব্যবস্থার পরিচিতি ভাবমূর্তিটি তৈরি হয়েছে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক নেতা আর তথাকথিত সচেতন নাগরিকদের সমবেত প্রচেষ্টায়। সেই ভাবমূর্তিকে ঘিরেই আবর্তিত হয় বিজয় আনন্দের মতো মানুষদের যাবতীয় উৎসাহ আর তৎপরতা। এমনকি সেই ভ াবমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতেই বাল থ্যাকারের মতো মানুষেরাও সেন্সর বোর্ডের কাছে দাবি করেন তথাকথিত 'ভারতীয় (অ াদতে হিন্দু) সংস্কৃতি'-র সংরক্ষণ। অবশ্য এব্যাপারে উপেক্ষা করা যায় না আইনব্যবস্থা বা আদালতেরও ভূমিকা।

১৯৫০ সালে প্রণীত ভারতীয় সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ভারতীয় নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে স্ বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তখন ভাবা গিয়েছিল, ফিল্ম সেন্সরশিপের ব্যবস্থাটি এর ফলে বাতিল হবে। কারণ, কোনো-কিছু প্রকাশের আগে প্রাক্-অনুমোদনের যে - শর্তটি এই ব্যবস্থার ভিত্তি, তা অবাধ মতপ্রকাশের আদর্শটিকেই বিঘ্নিত করে। কিন্তু, ১৯৫১ সালে ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই মৌলিক অধিকারগুলোর ওপর চাপানো হল একগুচ্ছ বিধিনিষেধ। এগুলোকে বলা হল, 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' বাreasonable restrictions । ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতের রায়ে ফিল্ম সেন্সরশিপকে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এইসব রায় দেওয়া হয়েছে চলচিচত্র-উপস্থাপনায়শ্লীল - অশ্লীল বা নৈতিক আচরণের মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। সামান্য যে -কয়েকটি ক্ষেত্রে ফিল্ম সেন্সরশিপের রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিষয়টি আদালতের সামনে এসেছে, সরকার শেষ পর্যন্ত নরম হয়েছেন বা পিছু হটেছেন। এটাকে বলা যায় কৌশলগত পশ্চাদপসরণ। নইলে হয়তো ফিল্ম সেন্সরশিপের র াজনৈতিক ধারাগুলো আদালতের চোখেও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু, এই হাতিয়ারটিকে সরকার যে কোনো মূল্যেই রক্ষা করতে চায়।২১ আর সেই জন্যেই ফিল্মেশ্লীল-অশ্লীল বা নৈতিক আচরণের প্রশ্ন মাঝে -মাঝে কিছুটা ছ াড় দেওয়া হয়। অথবা সে - ব্যাপারে আসর গরম করতে মঞ্চে আসেন বিজয় আনন্দের মতো মানুষ।

পদত্যাগ -বিতর্ক থেকে এটা এখন স্পষ্ট যে, ফিল্ম-সেন্সরশিপ বিষয়ে বিজয় আনন্দের সংস্কারচিন্তাশ্লীল-অশ্লীল আর নৈতিক আচরণের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকলেও উনি অতিক্রম করেছিলেন প্রশাসনিক আর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার লক্ষ্মণরেখা।

সেন্সর বোর্ড থেকে তাঁর অপসারণ তাই শেষ পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক ঘটনাই। আর এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল যে, ফিল্ম সেন্সরশিপ আসলে একটা রাজনৈতিক চাল। আর এই চালটা গত পঞ্চাশ বছর ধরেই চালছেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মহামান্য সরকার বাহাদুর। রঙ যাই হোক্ সেই সরকারের --- সবুজ, ধূসর, অথবা গেয়া।

নির্দেশিকা

১। দ্রষ্টব্য দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২৩জুলাই ২০০২।
২। দ্রষ্টব্য দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২৮ জুলাই ২০০২।
৩। সরকারি বয়ানের অনুবাদে আমি ‘প্রাক্-অনুমোদন’ কথাটা লিখলাম বটে, আদতে ওঁরাpre-censorship শব্দগুচ্ছই ব্যবহার করেছেন চিঠিতে। ফলে, সেন্সর বোর্ডের পোশাকি নাম যাই হোক, বিষয়টিকে ওঁরা কী চোখে দেখেন, তা বুঝতে খুব অসুবিধে হয় না। ওঁদের কাছে certification হল কথার কথা।
৪। দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২৩ জুলাই ২০০২।
৫। এ-ব্যাপারে দ্রষ্টব্য দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২৮ জুলাই ২০০২, পৃ ১৪। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম “ Sex, Sleaze and Censor Wrangles ”। ইন্ডিয়া টুডে, দিল্লী, ৩০ জুলাই - ৫ই আগষ্ট, ২০০২ সংখ্যার প্রচ্ছদ শিরোনাম“ঢব্দ ত্রন্দ্বপ্র শ্বন্ঞ্জ* ।
৬। ইন্ডিয়া টুডে, দিল্লী, ৩০শে জুলাই - ৫ই আগষ্ট, ২০০২, পৃ ৫৮। বিজয় আনন্দের সাক্ষাৎকার।
৭। দ্রষ্টব্য দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান, কলকাতা, ২৪শে জুলাই ২০০২। কিন্তু লক্ষ্য কন প্রবন্ধের শিরোনাম “Soft Porn, Hard Facts” ।
৮। এ-ব্যাপারে নীতি -সংত্রান্ত রূপরেখার জন্যে দ্রষ্টব্য মনরো প্রাইস এবং স্টেফান ভের্‌হাল্‌ষ্ট সম্পা. ‘ব্রডকাস্টিং রিফর্ম ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লী, ২০০০, পৃ ২০১।
৯।ইন্ডিয়া টুডে, দিল্লী ৩০ জুলাই - ৫ আগষ্ট, ২০০২, পৃ ৫৮। বিজয় আনন্দের সাক্ষাৎকার।
১০। বাক্-স্বাধীনতা এবং অবাধ মত-প্রকাশের অধিকার (Right to freedom of speech and Expression) । ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(ক)ধারা।
১১।দ্রষ্টব্য ‘রিপোর্ট অব দ্য এনকোয়ারি কমিটি অন ফিল্ম সেন্সরশিপ’(১৯৬৯), পৃ ৫৫।
১২। দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া-র ১৯ জুন ২০০২ তারিখের কলকাতা সংস্করণে প্রথম এ-বিষয়ে একটি খবর বেরিয়েছিল। পরে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে অনন্ত পটবর্ধনের পাঠানো ই-মেল থেকে। দ্য টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া ২৩ জুন জানায় যে অনন্ত পটবর্ধন এ-বিষয়ে সেন্সর বোর্ডের কাছে আপত্তি জানিয়েছেন এবং বিষয়টি বিবেচনাধীন। তার অল্পদিন পরেই শু হয়েছে লঙ্কাকান্ড। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, আপত্তিকর তালিকাটি ছ-দফা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একুশ দফা।
১৩।ইন্ডিয়া টুডে , দিল্লী, ৩০ জুলাই -৫ই আগষ্ট, ২০০২, পৃ ৫৮। বিজয় আনন্দের সাক্ষাৎকার।
১৪। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় রাখা আইন প্রণয়ন পরিষদের বিতর্ক সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত। ১৯১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এই বিতর্কের সূচনা হয়েছিল।
১৫। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় হোম (পলিটিক্যাল) / ফেব্রুয়ারী ১৯১৭/৮২-১১০ (পার্ট এ) ফাইলে দেখেছি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের এই নোট।
১৬। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় রাখা হোম (জেল্‌স্)/ ১৯২২/ ফাইল ত্রম ৭১ থেকে উদ্ধৃত।
১৭। দ্রষ্টব্য অণা বাসুদেব প্রণীত ‘লাইসেন্স অ্যান্ড লিবার্টি ইন দ্য ইন্ডিয়ান সিনেমা’, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ৮১।
১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
১৯। দ্রষ্টব্য নেভিল মার্চ হানিংস, ‘ফিল্ম সেন্সরস্ অ্যান্ড দ্য ল’, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৬৭,

পৃ. ২২৮।
২০। দ্রষ্টব্য অরণা বাসুদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।
২১। এই প্রসঙ্গে দেখুন আমারই আরো দুটি প্রবন্ধ -- "Political of Film Censorship : Limits of Tolerance," Economic and Political Weekly, August 31- September 6, 2002 এবং "সংবিধানের মৌলিক অধিকার, ফিল্ম সেন্সরশিপ ও আমরা," বারোমাস, শারদীয় ১৪০৯।
।। "অনুষ্টুপ" পত্রিকার শারদীয় ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।